।। রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ।।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের গীতপদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল কথার উচ্চারণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাই ভাবেই প্রবক্তা, সুর সেই ভাবকে জীবন্ত করিয়া তোলে। কথাগুলিকে গানের মধ্যে এক বিশেষ কার্য-সাধন করিতে হয়। প্রথমত কথার উচ্চারণে তাহার অর্থ ও ভাব সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গায়কের সুরের প্রতি দৃষ্টি এত নিবিষ্ট থাকে যে, কথাগুলির উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না—অর্থাৎ তাহাদের 'অর্থ-প্রকাশক' রূপে উচ্চারণ করা হয় না। আর একটি দোষণীয় জিনিষ হইল উচ্চারণে বিকৃতি ঘটানো, কোন না কোন Mannerism প্রকাশ করা। এই ত্রুটিগুলি হয় কতকগুলি ইচ্ছাকৃত আবার কতকগুলি হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত তাহা না জানার দরুণ।

অযথা কোন শব্দ চাপিয়া উচ্চারণ করা, ঘষিয়া উচ্চারণ করা, দীর্ঘনিঃশ্বাস টানা বা ফেলার সঙ্গে উচ্চারণ করা—যাহাতে চেষ্টা করা হয় বিষাদভাব জাগাইবার জন্য কান্নার ভঙ্গীতে, নাকি সুরে কোন স্বরবর্ণের বিকৃতি কাটাইয়া উচ্চারণ এ সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত গীতবিরুদ্ধ। যেমন—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী'—এই কথাগুলি গাহিবার কালে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারণ করা উচিত। কিন্তু যদি গাওয়া হয়—য্‌ যে ছিল আমার স্‌স্বপন চারিণী—আর যদি কণ্ঠ কম্পিত করা হয় তাহা হইলে ভাবাবেগ উদ্রেকের পরিবর্তে অত্যন্ত বিকৃত শুনাইবে।

উচ্চারণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল স্বরযুক্ত বর্ণ বা হসন্তবিহীন বর্ণ যেমন ব্যবহার হয় ঠিক তেমনি ব্যবহার করা উচিত। অ-কারগুলি ও-কার করিয়া আমরা কথা বলিলেও গানের উচ্চারণে অ-কারই রাখা প্রয়োজন। 'আমার মল্লিকাবনে' গানটিতে সাধারণত উচ্চারণ হয় মল্‌-লিকা, কিন্তু হওয়া উচিত ম-ল্লিকা।' 'ল' এর দ্বিত্ব ভাঙিয়া এইটি 'ল', 'ম' এর সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ইহাকে সহজেই অন্যভাবে বিযুক্ত করিয়া গাওয়া হয়।

আবার—

'মধু গন্-ধে ভরা, মৃদু স্নিগ্-ধ ছায়া নীপ কুন্-জ তলে
শ্যাম কান্-তি ময়ী···
ফিরে রক্-ত অলক্-তক ধৌত পায়ে
ধারা সিক্-ত বায়ে।'

এখানে গ-ন্ধে, স্নি-গ্-ধ' কু-ন্জ, কা-ন্তি, র-ক্ত, অল-ক্ত, সি-ক্ত- এইভাবে প্রথমের অক্ষরটির উচ্চারণ দীর্ঘায়িত করিয়া হসন্তের উচ্চারণ মৃদু করিতে হয়। অনেক শব্দের শেষ বর্ণ হসন্তযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিলেও হসন্তের উচ্চারণ একেবারে শেষে ফোটান দরকার। আগের স্বরযুক্ত বর্ণটি তখন দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় তাহার বিপরীত হইয়া যায়। যেমন—'ঝিমঝিম' 'ঝিমঝিম' গাহিবার সময় ঝিমঝিম্‌ম্‌—শেষের হসন্তযুক্ত 'ম' খুব প্রখর শুনায়।

কোথাও কোথাও 'এ' অক্ষরটি পুরোপুরি 'এ'-র মতই উচ্চারণ করা হয়। যেমন—'তুমি যেয়োনা এখনি'-তে আমাদের কথা বলিবার মত 'অ্যাখনি' হইবে না। আবার 'আমার মল্লিকাবনে' গানটিতে 'এখনো বনের গান বন্ধু, হয় নি তো অবসান তবু এখনি যাবে কি চলি' প্রথমটি অ্যাখনো হইবে কিন্তু দ্বিতীয়টি 'এখনি'—অ্যাখনি' নয়। উচ্চারণ সম্বন্ধে জানিবার আর একটি বিষয় হইল, কৃত্রিমভাবে কখনো গলা কাঁপানো উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবে গলার যে মৃদু কম্পন—যেমন কীর্তন বা লোকসঙ্গীতের গানে বৈশিষ্ট্য দেয়—তাহা খুব স্বাভাবিকভাবে কোথাও আসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু গানের Effect সৃষ্টির জন্য গলা কাঁপানো একটি বিশেষ দোষ।

আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতি
স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি।

এই কথাগুলিতে একটি একাকীত্বের নিঃশব্দ অভিনিবেশ ভরিয়া আছে। গায়ক যদি 'রাতি', 'মালা' এগুলির শেষে গলা কাঁপাইতে শুরু করেন, তাহা

রহিল ঐ একাকীত্ব, স্মৃতি, শ্রাবণের বর্ষণে যাহা আকুলিত হইয়া উঠে—এই গানের ভাষায় আর মন যায় না। বাকী চাপা পড়িয়া যায়, কেবল গলা কাঁপানোর আওয়াজই শোনা যায়।

নিজেকে জাহির করিবার জন্য— কথার উচ্চারণ আর সুর যেন কখনও একে অপরকে আঘাত না করে। এই কথাটি সব সময় মনে রাখিতে হইবে। যেমন জলে সাঁতার কাটিতে যাইয়া অপটু সাঁতারু যত না সাঁতার কাটে তাহা অপেক্ষা বেশী হাত পা ছোঁড়ে, জল ছিটায়, আশেপাশের জীবদের বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু যে উত্তম সাঁতারু সে জলের মধ্য দিয়া তর তর করিয়া আগাইয়া যায়। না একটু জল ছিটকায়, না একটু জলকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। এইটাই হইল গানের আর্ট। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কখনও শ্রোতা অনুভব না করেন যে তিনি কেবল কথাগুলি শুনিতেছেন বা কেবল সুর শুনিতেছেন। তাঁহাদের মনে হওয়া উচিত ভাবময় একটি কথার সুরই শুনিতেছেন যাহা তাঁহার ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পর্দায় আঘাত হানিতেছে। তাঁহার ভাবমানসে সূক্ষ্ম বোধগুলি জাগিয়া উঠিয়া আর একটি সুগভীর আনন্দস্বাদ বহন করিয়া আনিতেছে। যে গানগুলিতে মীড়ের ব্যবহার বেশী সেগুলিতে কথার উচ্চারণে একটু অস্পষ্টতা ফোটে—সেখানে গায়কের একটু সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।